ভগিনী নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ

সরোজ উপাধ্যায়

অধ্যাপক, সিস্টার
নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি

ভগিনী নিবেদিতা এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। ভারতের প্রতি তাঁর নিঃশেষ আত্মনিবেদন তাঁকে অপরূপ মহিমায় মহিমান্বিত করেছে। তিনি এদেশের সভ্যতা সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। ভারতের বহু মনীষীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা, হৃদ্যতা বহুমাত্রিক রূপ পেয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আরও বহুজনের সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক ছিল। এই নিবন্ধে আমরা নিবেদিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাববিনিময় এবং আন্তরিকতা বিষয়ে আলোকপাত করব।

নিবেদিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, তাঁর কাছে তিনি যতটা উপকৃত হয়েছেন সেরকম আর কারও কাছে হননি।

নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ছোট গল্প ইংরেজিতে অনুবাদ করে প্রকাশ করেন, যথা ক্ষুধিত পাষাণ, কাবুলিওয়ালা, দেনা পাওনা, ছুটি। নিবেদিতার প্রতি কবির প্রবল আস্থা ছিল। তাঁর অনুরোধে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে স্বামী সদানন্দ প্রমুখের সঙ্গে তিনি কেদার বদরি পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই সময় শিলাইদহে থাকতেন। নিবেদিতা সেখানে বারকয়েক যান। ১৯০৪ সালে জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে শিলাইদহে গিয়েছিলেন তিনি। গ্রামের মানুষের সরলতা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তাদের তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখেছিলেন। গ্রামবাসীরা তাঁকে নিজেদের সুখ দুঃখের কথা বলত অকপটভাবে, যেন তিনি তাদের কত আপনজন। এই শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার আন্তরিকতা প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি লিখেছেন, "বস্তুত তিনি ছিলেন লোকমাতা। যে মাতৃভাব পরিবারের বাহিরের একটি সমগ্র দেশের উপরে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে তাহার মূর্তি তো ইতিপূর্বে আমরা দেখি

নাই। এসম্বন্ধে পুরুষের যে কর্তব্যবোধ তাহার কিছু কিছু আভাস পাইয়াছি, কিন্তু রমণীর যে পরিপূর্ণ মমত্ববোধ তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। তিনি যখন বলিতেন Our people তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত আমাদের কাহারও কণ্ঠে তেমনটি তো লাগে না। ভগিনী নিবেদিতা দেশের মানুষকে যেমন সত্য করিয়া ভালোবাসিতেন তাহা যে দেখিয়াছে সে নিশ্চয়ই ইহা বুঝিয়াছে যে, দেশের লোককে আমরা হয়তো সময় দিই, অর্থ দিই, এমন-কি, জীবনও দিই কিন্তু তাহাকে হৃদয় দিতে পারি নাই—তাহাকে তেমন অত্যন্ত সত্য করিয়া নিকটে করিয়া জানিবার শক্তি আমরা লাভ করি নাই।

"আমরা যখন দেশ বা বিশ্বমানব বা ঐরূপ কোনো-একটা সমষ্টিগত সত্তাকে মনের মধ্যে দেখিতে চেষ্টা করি তখন তাহাকে যে অত্যন্ত অস্পষ্ট করিয়া দেখি তাহার কারণ আছে। আমরা এইরূপ বৃহৎ ব্যাপক সত্তাকে কেবলমাত্র মন দিয়াই দেখিতে চাই, চোখ দিয়া দেখি না। যে লোক দেশের প্রত্যেক লোকের মধ্যে সমগ্র দেশকে দেখিতে পায় না, সে মুখে যাহাই বলুক দেশকে যথার্থভাবে দেখে না। ভগিনী নিবেদিতাকে দেখিয়াছি তিনি লোকসাধারণকে দেখিতেন, স্পর্শ করিতেন, শুদ্ধমাত্র তাহাকে মনে মনে ভাবিতেন না। তিনি গণ্ডগ্রামের কুটীরবাসিনী একজন সামান্য মুসলমানরমণী-কে যেরূপ অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সহিত সম্ভাষণ করিয়াছেন দেখিয়াছি, সামান্য লোকের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে—কারণ ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে বৃহৎ মানুষকে প্রত্যক্ষ করিবার সেই দৃষ্টি, সে অতি অসাধারণ। সেই দৃষ্টি তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ ছিল বলিয়াই এতদিন ভারতবর্ষের এত নিকটে বাস করিয়া তাঁহার শ্রদ্ধা ক্ষয় হয় নাই।"[১]

রবীন্দ্রনাথ তথা অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজের ব্যক্তিদের সঙ্গে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ এবং স্বামীজীর নিবিড় যোগসাধনের উদ্দেশ্যে বাগবাজারে বোসপাড়া লেনের বাড়িতে নিবেদিতা একটি চা-চক্রের আয়োজন করেন। কিন্তু নিবেদিতার আশা খুব একটা সফল হয়নি। এই সভায় স্বামীজী ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও জগদীশচন্দ্র বসুও উপস্থিত ছিলেন। এদেশে আসার পর নিবেদিতা দেশের বিশিষ্ট মানুষদের সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছিলেন। একদিন তিনি ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রণাম করে আলাপ করেন। মহর্ষি বিবেকানন্দকে দেখবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। বিবেকানন্দ একদিন নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে জোড়াসাঁকো গিয়েছিলেন। ঠাকুর পরিবারের অনেকেই সেদিন স্বামিজীকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। মহর্ষির সঙ্গে স্বামীজীর সেদিন বিবিধ প্রসঙ্গ নিয়ে কথা হয়েছিল।

কবি জানিয়েছেন, ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর যখন প্রথম আলাপ হয় তখন তিনি এদেশে অল্পদিন হল এসেছেন। "আমি ভাবিয়াছিলাম সাধারণত ইংরেজ মিশনরি মহিলারা যেমন হইয়া থাকেন ইনিও সেই শ্রেণীর লোক, কেবল ইহার ধর্মসম্প্রদায় স্বতন্ত্র।

"সেই ধারণা আমার মনে ছিল বলিয়া আমার কন্যাকে শিক্ষা দিবার ভার লইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কী শিক্ষা দিতে চাও? আমি বলিলাম, ইংরেজি, এবং সাধারণত

ইংরেজি ভাষা অবলম্বন করিয়া যে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। তিনি বলিলেন, বাহির হইতে কোনো একটা শিক্ষা গিলাইয়া দিয়া লাভ কী? জাতিগত নৈপুণ্য ও ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতারূপে মানুষের ভিতরে যে জিনিসটা আছে তাহাকে জাগাইয়া তোলাই আমি যথার্থ শিক্ষা মনে করি। বাঁধা নিয়মের বিদেশী শিক্ষার দ্বারা সেটাকে চাপা দেওয়া আমার কাছে ভালো বোধ হয় না।

"মোটের উপর তাঁহার সেই মতের সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য ছিল না। কিন্তু কেমন করিয়া মানুষের ঠিক স্বকীয় শক্তি ও কৌলিক প্রেরণাকে শিশুর চিত্তে একেবারে অঙ্কুরেই আবিষ্কার করা যায় এবং তাহাকে এমন করিয়া জাগ্রত করা যায় যাহাতে তাহার নিজের গভীর বিশেষত্ব সার্বভৌমিক শিক্ষার সঙ্গে ব্যাপকভাবে সুসংগত হইয়া উঠিতে পারে তাহার উপায় তো জানি না। কোনো অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন গুরু এ কাজ নিজের সহজবোধ হইতে করিতেও পারেন, কিন্তু ইহা তো সাধারণ শিক্ষকের কর্ম নহে। কাজেই আমরা প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া মোটা রকমে কাজ চালাই। তাহাতে অন্ধকারে ঢেলা মারা হয় —তাহাতে অনেক ঢেলা অপব্যয় হয়, এবং অনেক ঢেলা ভুল জায়গায় লাগিয়া ছাত্র বেচারাকে আহত করে। মানুষের মতো চিত্তবিশিষ্ট পদার্থকে লইয়া এমনতরো পাইকারি ভাবে ব্যবহার করিতে গেলে প্রভূত লোকসান হইবেই সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজে সর্বত্র তাহা প্রতিদিনই হইতেছে।

"যদিচ আমার মনে সংশয় ছিল, এরূপ শিক্ষা দিবার শক্তি তাঁহার আছে কি না, তবু আমি তাঁহাকে বলিলাম, আচ্ছা বেশ, আপনার নিজের প্রণালীমতই কাজ করিবেন, আমি কোনোপ্রকার ফরমাশ করিতে চাই না। বোধ করি ক্ষণকালের জন্য তাঁহার মন অনুকূল হইয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই বলিলেন, না, আমার এ কাজ নহে। বাগবাজারের একটি বিশেষ গলির কাছে তিনি আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন—সেখানে তিনি পাড়ার মেয়েদের মাঝখানে থাকিয়া শিক্ষা দিবেন তাহা নহে, শিক্ষা জাগাইয়া তুলিবেন। মিশনরির মতো মাথা গণনা করিয়া দলবৃদ্ধি করিবার সুযোগকে, কোনো-একটি পরিবারের মধ্যে নিজের প্রভাব বিস্তারের উপলক্ষকে, তিনি অবজ্ঞা করিয়া পরিহার করিলেন।"[২]

১৮৯৮ সালের ২৮ জানুয়ারি নিবেদিতা দখিনা বাতাসের মতোই ভারতে এলেন স্বামীজীর ডাকে। তিনি স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ঘটাচ্ছিলেন নিজের মতো করে। রবীন্দ্রনাথ এই সময় ছোট মেয়ে মীরার শিক্ষয়িত্রীরূপে নিবেদিতাকে চেয়েছিলেন। নিবেদিতা সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূচনা হল তখন থেকেই। স্বামী বিবেকানন্দের দেহরক্ষার পর তাঁর অগ্নিময় বাণী নিবেদিতা ভারতের সর্বত্র ছড়াতে লাগলেন। ভারতের বিপ্লবীসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ তৈরি হল তাঁর। নিবেদিতা ও অরবিন্দের যোগাযোগ নিবেদিতার বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। নিবেদিতার লেখা 'Kali the Mother' বইটির মৃত্যুদর্শন একসময় বিপ্লবীদের প্রেরণা ছিল। তাঁর বিপ্লবী সত্তার

অকাট্য প্রমাণ না থাকলেও সেইসময় ব্রিটিশ সরকার তাঁকে স্বদেশিদের নেত্রী মনে করতেন।

রাজদ্রোহের অভিযোগে যখন বালগঙ্গাধর তিলককে কারারুদ্ধ করা হয়, তখন সারা দেশের ক্ষোভের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মোকদ্দমা পরিচালনার অর্থ সংগ্রহ করেন তিনি। টাউন হলে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদসভায় 'কণ্ঠরোধ' নামে প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ পাঠ শুনে নিবেদিতা বুঝেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ শুধুই ড্রয়িংরুম-বিলাসী কবি নন। দশের, দেশের সুখদুঃখের সঙ্গে তাঁর গভীর যোগ। দেশকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ ও নিবেদিতার বন্ধুত্ব এক অন্য মাত্রা পেল। অনেকে মনে করেন রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার চরিত্রটিকে অমরতা দিয়েছেন 'গোরা' উপন্যাসের গোরা চরিত্রের মধ্য দিয়ে।

স্বদেশি আন্দোলনের সময় নিবেদিতা শহরে কাজ আরম্ভ করেন এবং রবীন্দ্রনাথ গ্রামে। স্বদেশি আন্দোলনের প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথ এবং নিবেদিতা শুধু বক্তার আসনে থাকেননি। তাঁরা ভারতকে শিল্পে স্বাবলম্বী হতেও শিখিয়েছেন। নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক বাণীগুলি ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে রঙিন করে লিখিয়ে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখতেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জোড়াসাঁকোয় দেখা করে তাঁর লেখা স্বদেশি সংগীতগুলির প্রশংসা করেন তিনি। তবে রবীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দিতে চাননি, নিবেদিতাকে এই বিষয়ে তাঁর মতপার্থক্যের কথা তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন।

নিবেদিতার লেখা 'দ্য ওয়েব অফ ইন্ডিয়ান লাইফ'-এর ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বইটির ভূমিকায় লিখেছিলেন, "She did not come to us with the impertinent curiosity of a visitor, nor did she elevate herself on a special high perch with the idea that a bird's eye view is truer than the human view because of its superior aloofness. She lived our life and came to know us by becoming one of ourselves."[৩]

রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতাকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'লোকমাতা'। ভারতবাসীর সঙ্গে নিবেদিতার ছিল বাৎসল্যের সম্পর্ক। ঠাকুরবাড়ির আর এক প্রতিভা শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিবেদিতা সম্পর্কে বলেছিলেন, ''ভারতবর্ষকে বিদেশী যাঁরা সত্যই ভালবেসেছিলেন তার মধ্যে নিবেদিতার স্থান সব চেয়ে বড়।"[৪] রবীন্দ্রনাথও গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন, "ভগিনী নিবেদিতা একান্ত ভালোবাসিয়া সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে ভারতবর্ষে দান করিয়াছিলেন, তিনি নিজেকে কিছুমাত্র হাতে রাখেন নাই। অথচ নিতান্ত মৃদুস্বভাবের লোক ছিলেন বলিয়াই যে নিতান্ত দুর্বলভাবে তিনি আপনাকে বিলুপ্ত করিয়াছিলেন তাহা নহে। পূর্বেই এ কথার আভাস দিয়াছি, তাঁহার মধ্যে একটা দুর্দান্ত জোর ছিল, এবং সে জোর যে কাহারও প্রতি প্রয়োগ করিতেন না তাহাও নহে। তিনি যাহা চাহিতেন তাহা সমস্ত মন প্রাণ দিয়াই চাহিতেন এবং ভিন্ন মতে বা প্রকৃতিতে যখন তাহা বাধা পাইত তখন তাঁহার অসহিষ্ণুতাও যথেষ্ট উগ্র হইয়া উঠিত। তাঁহার এই পাশ্চাত্য-স্বভাবসুলভ প্রতাপের প্রবলতা কোনো অনিষ্ট করিত না তাহা আমি মনে করি না—কারণ,

যাহা মানুষকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে তাহাই মানুষের শত্রু—তৎসত্ত্বেও বলিতেছি, তাঁহার উদার মহত্ত্ব তাঁহার উদগ্র প্রবলতাকে অনেক দূরে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। তিনি যাহা ভালো মনে করিতেন তাহাকেই জয়ী করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত জোর দিয়া লড়াই করিতেন, সেই জয়গৌরব নিজে লইবার লোভ তাঁহার লেশমাত্র ছিল না। দল বাঁধিয়া দলপতি হইয়া উঠা তাঁহার পক্ষে কিছুই কঠিন ছিল না, কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে দলপতির চেয়ে অনেক উচ্চ আসন দিয়াছিলেন, আপনার ভিতরকার সেই সত্যের আসন হইতে নামিয়া তিনি হাটের মধ্যে মাচা বাঁধেন নাই। এ দেশে তিনি তাঁহার জীবন রাখিয়া গিয়াছেন কিন্তু দল রাখিয়া যান নাই।''

তিনি নিবেদিতার এদেশের প্রতি ভালবাসাকে প্রকাশ করতে গিয়ে একটি অভিনব উপমার সাহায্য নিয়েছেন। শিবের রূপ দর্শনীয় না হওয়া সত্ত্বেও পার্বতী তাঁকে পাওয়ার জন্য কঠিন তপস্যায় ব্রতী হয়েছিলেন। নিবেদিতা এই তমসাচ্ছন্ন দেশকে ভালবেসেছেন হৃদয় দিয়ে। এই ভালবাসাই তাঁকে এদেশের মানুষের জন্য গভীর আত্মত্যাগ ও কঠিন কর্মসাধনায় ব্রতী করেছিল। কবি লিখেছেন, "শিবের প্রতি সতীর সত্যকার প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি অর্ধাশনে অনশনে অগ্নিতাপ সহ্য করিয়া আপনার অত্যন্ত সুকুমার দেহ ও চিত্তকে কঠিন তপস্যায় সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সতী নিবেদিতাও দিনের পর দিন যে তপস্যা করিয়াছিলেন তাহার কঠোরতা অসহ্য ছিল—তিনিও অনেকদিন অর্ধাশন অনশন স্বীকার করিয়াছেন, তিনি গলির মধ্যে যে বাড়ির মধ্যে বাস করিতেন সেখানে বাতাসের অভাবে গ্রীষ্মের তাপে বীতনিদ্র হইয়া রাত কাটাইয়াছেন, তবু ডাক্তার ও বান্ধবদের সনির্বন্ধ অনুরোধেও সে বাড়ি পরিত্যাগ করেন নাই; এবং আশৈশব তাঁহার সমস্ত সংস্কার ও অভ্যাসকে মুহূর্তে মুহূর্তে পীড়িত করিয়া তিনি প্রফুল্লচিত্তে দিন যাপন করিয়াছেন—ইহা যে সম্ভব হইয়াছে এবং এই-সমস্ত স্বীকার করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ হয় নাই তাহার একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাঁহার প্রীতি একান্ত সত্য ছিল, তাহা মোহ ছিল না। মানুষের মধ্যে যে শিব আছেন সেই শিবকেই এই সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই মানুষের অন্তর-কৈলাসের শিবকেই যিনি আপন স্বামীরূপে লাভ করিতে চান তাঁহার সাধনার মতো এমন কঠিন সাধনা আর কার আছে?"

রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র বসু, নিবেদিতা, ক্রিস্টিন, অবলা বসু, র‍্যাটক্লিফ দম্পতি, স্বামী সদানন্দ, বেলুড় মঠের সপ্তম অধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দ (তখন ব্রহ্মচারী অমূল্য) বুদ্ধগয়ায় গিয়েছিলেন ১৯০৪ সালের অক্টোবর মাসে। এই পবিত্র তীর্থস্থানে আনন্দময় কয়েকটি দিন কাটিয়েছিলেন তাঁরা। বুদ্ধগয়ায় তাঁরা মহান্তর অতিথি হয়ে ছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে নিবেদিতা Light of Asia, ওয়ারেনের বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করতেন, কবি গান ও আবৃত্তি করতেন। কখনও বৌদ্ধদর্শন নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হত। আচার্য বসুও এই আলোচনায় অংশ নিতেন। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পিতৃস্মৃতি গ্রন্থে লিখেছেন, এক-এক দিন নিবেদিতা এক-

একটি তর্ক তুলতেন আর রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করতেন যথাযোগ্য উত্তর দিতে। এই তিন মনীষীর একত্র সমাবেশ একটি মনোমুগ্ধকর পরিবেশ তৈরি করেছিল। কত গল্প কত আলোচনা কত পরামর্শই না হয়েছিল। কবিপুত্র দুঃখ করে লিখেছেন, ''আজ সেই আলোচনার কোন অনুলিপি নেই।''

কবির সঙ্গে ভগিনীর সম্পর্ক ছিল মননের, অন্তরের এবং শ্রদ্ধার। দুজনেই দুজনের মননশীলতাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিলেন। এই অন্তরঙ্গতা আমাদের সংস্কৃতিকে ঋদ্ধ করেছে গভীরভাবে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "যেমনই হউক, তিনি হিন্দু ছিলেন বলিয়া নহে, তিনি মহৎ ছিলেন বলিয়াই আমাদের প্রণম্য। তিনি আমাদেরই মতন ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিব তাহা নহে, তিনি আমাদের চেয়ে বড়ো ছিলেন বলিয়াই তিনি আমাদের ভক্তির যোগ্য। সেই দিক দিয়া যদি তাঁহার চরিত আলোচনা করি তবে, হিন্দুত্বের নহে, মনুষ্যত্বের গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত হইব।

''তাঁহার জীবনে সকলের চেয়ে যেটা চক্ষে পড়ে সেটা এই যে, তিনি যেমন গভীরভাবে ভাবুক তেমনি প্রবলভাবে কর্মী ছিলেন। কর্মের মধ্যে একটা অসম্পূর্ণতা আছেই—কেননা তাহাকে বাধার মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতে হয়—সেই বাধার নানা ক্ষতচিহ্ন তাহার সৃষ্টির মধ্যে থাকিয়া যায়। কিন্তু ভাব জিনিসটা অক্ষুণ্ণ অক্ষত। এইজন্য যাহারা ভাববিলাসী তাহারা কর্মকে অবজ্ঞা করে অথবা ভয় করিয়া থাকে। তেমনি আবার বিশুদ্ধ কেজো লোক আছে তাহারা ভাবের ধার ধারে না, তাহারা কর্মের কাছ হইতে খুব বড়ো জিনিস দাবি করে না বলিয়া কর্মের কোনো অসম্পূর্ণতা তাহাদের হৃদয়কে আঘাত করিতে পারে না।

''কিন্তু ভাবুকতা যেখানে বিলাসমাত্র নহে, সেখানে তাহা সত্য, এবং কর্ম যেখানে প্রচুর উদ্যমের প্রকাশ বা সাংসারিক প্রয়োজনের সাধনামাত্র নহে, যেখানে তাহা ভাবেরই সৃষ্টি, সেখানে তুচ্ছও কেমন বড়ো হইয়া উঠে এবং অসম্পূর্ণতাও মেঘপ্রতিহত সূর্যের বর্ণচ্ছটার মতো কিরূপ সৌন্দর্যে প্রকাশমান হয় তাহা ভগিনী নিবেদিতার কর্ম যাঁহারা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারা বুঝিয়াছেন।"[৫]

কবি এই মহীয়সীর অন্তর্নিহিত প্রেরণা-শক্তিকে, তাঁর আদর্শকে, কর্মপ্রকৃতিকে গভীর অনুভবের সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন। নিবেদিতার আন্তরিকতা ও হৃদয়বত্তা আর কবির সুগভীর সংবেদনশীল চিন্তার ভাববিনিময় এই দুই মহান মনীষীর সম্পর্ককে গৌরবমণ্ডিত করেছে।✠

তথ্যসূত্র

১। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, খণ্ড ৯, বিশ্বভারতী ১২৫ তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, কলকাতা ১৩৯৬, পৃঃ ৬১৬ [এরপর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*]

২। তদেব, পৃঃ ৬১৩

৩। Sister Nivedita, *The Web of Indian Life*, Introduction by Rabindra Nath Tagore, Internet edition, https:// sacred-texts.com

৪। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, *ভগিনী নিবেদিতা,* সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, কলকাতা, ২০০৫, পৃঃ ৩২১

৫। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, খণ্ড ৯, পৃঃ ৬১৪-১৫